সেপ্টোপাসের খিদে

কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে আপনা থেকেই মুখ থেকে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল।

বিকেল থেকে এই নিয়ে চারবার হল; মানুষে কাজ করে কী করে? কার্তিকটাও সেই যে বাজারে গেছে আর ফেরার নামটি নেই।

লেখাটা বন্ধ করে নিজেকেই উঠে যেতে হল।

দরজা খুলে আমি তো অবাক! আরে, এ যে কান্তিবাবু!

বললাম, 'কী আশ্চর্য! আসুন, আসুন...'

'চিনতে পেরেছ?'

'প্রায় চেনা যায় না বললেই চলে!'

ভদ্রলোককে ভিতরের ঘরে এনে বসালাম। সত্যি, দশ বছরে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন হয়েছে কান্তিবাবুর চেহারায়। এঁকেই নাইনটিন ফিফ্‌টিতে আসামের জঙ্গলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস হাতে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখেছি। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স তখনই। কিন্তু একটি চুলও পাকেনি। আর ওই বয়সে উৎসাহ ও এনার্জির যা নমুনা দেখেছিলাম, তা সচরাচর আমাদের তরুণদের মধ্যেও দেখা যায় না।

'তোমার অর্কিডের শখ এখনও আছে দেখছি।'

আমার ঘরের জানলায় একটা টবের মধ্যে কান্তিবাবুরই দেওয়া একটা অর্কিড ছিল। শখ এখনও আছে বললে অবিশ্যি ভুল বলা হবে। কান্তিবাবুই গাছপালা সম্পর্কে একটা কৌতূহল আমার মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন। তারপর উনি দেশছাড়া হবার পর থেকে ক্রমে সে শখটা আপনা থেকেই উবে গেছে—যেমন অন্য শখগুলোও গেছে। এখন লেখা নিয়েই থাকি। ইদানীং দিনকাল বদলেছে। বই লিখেও আজকাল রোজগার হয়। তিনটি বইয়ের বিক্রির টাকাতেই তো প্রায় সংসার চলে যাচ্ছে আমার! অবিশ্যি সংসার বলতে আমি, আমার বিধবা মা, আর চাকর কার্তিক। চাকরি একটা আছে বটে, তবে আশা আছে বই থেকে তেমন-তেমন রোজগার হলে চাকরি-বাকরি ছেড়ে দিয়ে কেবল লিখব, আর লেখার অবসরে দেশভ্রমণ করব।

কান্তিবাবু বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ শিউরে উঠলেন।

বললাম, 'ঠাণ্ডা লাগছে? জানলাটা বন্ধ করে দেব? এবার কলকাতায় শীতটা...'

'না, না। ওরকম আজকাল মাঝে মাঝে হয়। বয়স হয়েছে তো? তাই নার্ভগুলো ঠিক...'

অনেক প্রশ্ন মাথায় আসছিল। কার্তিক ফিরেছে। ওকে চা আনতে বললাম।

কান্তি বললেন, 'বেশিক্ষণ বসব না। তোমার উপন্যাস হাতে এসেছিল একখানা। তোমার প্রকাশকের কাছ থেকেই ঠিকানা সংগ্রহ করে এখানে এলুম। এসেছি একটা বিশেষ দরকারে।'

'বলুন না! তবে তার আগে—মানে, কবে দেশে ফিরলেন, কোথায় ছিলেন, কোথায় আছেন, এসবগুলো জানতে খুব ইচ্ছে করছে।'

'ফিরেছি দু' বছর। ছিলুম আমেরিকায়। আছি বারাসাতে।'

'বারাসাত?'

'একটি বাড়ি কিনেছি।'

'বাগান আছে?'

'আছে।'

'আর গ্রিন-হাউস?'

কান্তিবাবুর আগের বাড়ির বাগানে একটি চমৎকার গ্রিন-হাউস বা কাচের ঘর ছিল, যাতে তিনি তাঁর দুষ্প্রাপ্য গাছপালাগুলিকে তোয়াজে রাখতেন। কতরকম অদ্ভুত গাছ যে দেখেছি সেখানে তার ঠিক নেই! এই অর্কিডই তো প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি রকমের। তার ফুলের বৈচিত্র্য উপভোগ করেই একটা পুরো দিন অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যেত।

কান্তিবাবু একটু ভেবে বললেন, 'হ্যাঁ। একটা গ্রিন-হাউসও আছে।'

'আপনার গাছপালার শখ তা হলে এই দশ বছরে কিছু কমেনি?'

'না।'

কান্তিবাবু আমার ঘরের উত্তরের দেয়ালের দিকে চেয়ে রয়েছেন দেখে আমারও চোখ সেইদিকে গেল। মাথাসমেত একটি রয়াল বেঙ্গলের ছাল সেখানে ঝোলানো রয়েছে। বললাম, 'চিনতে পারছেন?'

'এটা সেই বাঘটাই তো?'

'হ্যাঁ। ওই দেখুন কানের পাশটায় বুলেটের ফুটোটাও রয়েছে।'

'আশ্চর্য টিপ ছিল তোমার। এখনও চালাতে পারো ওরকম অব্যর্থ গুলি?'

'জানি না। অনেকদিন পরীক্ষা করিনি। শিকার ছেড়েছি প্রায় পাঁচ-সাত বছর।'

'কেন?'

'অনেক তো মারলাম। বয়স হয়েছে, তাই আর প্রাণিহত্যা...'

'মাছ-মাংস ছেড়েছ নাকি? নিরামিষ খাচ্ছ?'

'না।'

'তবে? এ তো শুধু হত্যা। বাঘ মারলে, কি কুমির মারলে, কি মোষ মারলে—ছাল ছাড়িয়ে মাথা স্টাফ করে, কি শিং মাউন্ট করে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলে। ঘরের শোভা বাড়ল, এসে কেউ আঁতকে উঠল, কেউ বাহবা দিল, তোমারও জোয়ান বয়সের অ্যাডভেঞ্চারের কথা মনে পড়ে গেল। আর মুরগি ছাগল ইলিশ মাগুর যে নিজে চিবিয়ে খেয়ে ফেলছ হে! শুধু প্রাণিহত্যা নয়, প্রাণী হজম—অ্যাঁ?'

কী আর বলি! অস্বীকার করতে পারলাম না।

কার্তিক চা দিয়ে গেল।

কান্তিবাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে হঠাৎ আবার শিউরে উঠে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলেন।

চুমুক দিয়ে বললেন, 'জীবে জীবে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক সে তো সৃষ্টির গোড়ার কথা হে! ওই যে টিকটিকিটা ওত পেতে রয়েছে, দেখেছ?'

দেখলাম কিং কোম্পানির ক্যালেন্ডারটার ঠিক উপরেই একটা টিকটিকি তার থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে একটা উচ্চিংড়ের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। তারপর দেখতে দেখতে গুটিগুটি করে অতীব সন্তর্পণে পোকাটার দিকে অগ্রসর হয়ে হঠাৎ তীরের মতো এক ছোবলে সেটাকে মুখে পুরে নিল।

কান্তিবাবু বললেন, 'ব্যস। চলল ডিনার। খালি খাওয়া আর খাওয়া। খাওয়াটাই সব। বাঘে মানুষ খাচ্ছে, মানুষ ছাগল খাচ্ছে, আর ছাগল কী না খাচ্ছে! ভাবতে গেলে কী বন্য, কী আদিম, কী হিংস্র মনে হয় বলো তো! অথচ এই হল নিয়ম। এ ছাড়া গতি নেই। এ না হলে সৃষ্টি অচল হয়ে যাবে।'

'নিরামিষ খাওয়াটা বোধহয় এর চেয়ে অনেক...ইয়ে?'

'কে বললে তোমায়? শাক-সবজি তরি-তরকারি এসবের কি প্রাণ নেই?'

'তা তো আছেই! জগদীশ বোস আর আপনার দৌলতে সে-কথা সবসময়ই মনে থাকে। তবে, মানে ঠিক সেরকম প্রাণ নয় তো! গাছপালা আর জীবজন্তু কি এক?'

'তোমার মতে কি দুয়ে অনেক প্রভেদ?'

'প্রভেদ নয়? যেমন ধরুন—গাছ হেঁটে বেড়াতে পারে না, শব্দ করতে পারে না, মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না—এমনকী, মন বলে যে কিছু আছে তাই তো বোধহয় বোঝবার কোনও উপায় নেই।

তাই নয় কি?'

কান্তিবাবু কী জানি বলতে গিয়েও বললেন না।

চা-টা শেষ করে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থেকে অবশেষে আমার দিকে চোখ তুলে চাইলেন। তাঁর চোখের করুণ সংশয়াকুল দৃষ্টি দেখে আমার মনটা হঠাৎ কেমন যেন একটা অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠল। সত্যি, ভদ্রলোকের চেহারায় কী আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটেছে।

কান্তিবাবু ধীরকণ্ঠে বললেন, 'পরিমল, আমার বাড়ি এখান থেকে একুশ মাইল। আটান্ন বছর বয়সে নিজে কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ঘোরাঘুরি করে তোমার ঠিকানা সংগ্রহ করে যখন এখানে এসেছি, তখন নিশ্চয়ই তার একটা গূঢ় কারণ আছে। এটা বুঝতে পারছ তো? না কি ওইসব আজেবাজে রঙ চড়ানো গল্পগুলো লিখে সে বুদ্ধিটাও হারিয়েছ? ভাবছ—লোকটা একটা টাইপ বটে। একটা গল্পে লাগাতে পারলে বেশ হয়!'

লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কান্তিবাবু ভুল বলেননি। তাঁকে একটা গল্পের চরিত্র হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা মনের আনাচে-কানাচে সত্যিই ঘোরাফেরা করছিল।

ভদ্রলোক বললেন, 'জীবনের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন হলে যা-ই লেখো না কেন, সব ফাঁকা আর ফাঁকি হয়ে যাবে। আর এটাও মনে রেখো যে তুমি কল্পনায় যতই রঙ চড়াও না কেন, বাস্তবের চেয়ে কখনওই তা বেশি বিস্ময়কর হতে পারবে না।...যাক গে, আমি তোমায় উপদেশ দিতে আসিনি। আমি এসেছি, সত্যি বলতে কি, তোমার সাহায্য ভিক্ষে করতে।'

কান্তিবাবু আবার বাঘটার দিকে চাইলেন। কী সাহায্যের কথা বলছেন ভদ্রলোক?

'তোমার বন্দুকটা আছে, না বিদেয় করে দিয়েছ?'

আমি একটু চমকে গিয়ে ভদ্রলোকের দিকে চাইলাম। বন্দুকের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?

বললাম, 'আছে। তবে মরচে ধরেছে বোধহয়; কিন্তু কেন?'

'কাল ওটা নিয়ে আমার বাড়িতে একবার আসতে পারবে?'

আমি আবার ভদ্রলোকের দিকে চাইলাম। না, রসিকতার কোনও ইঙ্গিত নেই তাঁর দৃষ্টিতে।

'অবিশ্যি কেবল বন্দুক না। টোটাও লাগবে।'

কান্তিবাবুর এ অনুরোধে কী বলব চট করে ভেবে পেলাম না। একবার মনে হল, কথা শুনে হয়তো বুঝতে পারছি না, কিন্তু আসলে হয়তো ভদ্রলোকের মাথাখারাপ হয়ে গেছে। খামখেয়ালি, সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই। নইলে আর জীবন বিপন্ন করে উদ্ভট গাছপালার উদ্দেশে কেউ বনবাদাড়ে ধাওয়া করে?

বললাম, 'বন্দুক নিয়ে যেতে আমার কোনও আপত্তি নেই, তবে কারণটা জানার জন্য বিশেষ কৌতূহল হচ্ছে। আপনাদের ও অঞ্চলে জন্তু-জানোয়ার কি চোর-ডাকাতের উপদ্রব হচ্ছে নাকি?'

কান্তিবাবু বললেন, 'সেসব তুমি এলে পরে বলব। বন্দুকের প্রয়োজন শেষ পর্যন্ত না-ও হতে পারে। আর যদি-বা হয়ও, এটুকু বলে রাখছি যে, তোমায় কোনও দণ্ডনীয় অপরাধের দায়ে পড়তে হবে না।

কান্তিবাবু উঠে পড়লেন। তারপর আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'তোমার কাছেই এসেছি, কারণ শেষ যা দেখেছি তোমায়, তাতে মনে হয়েছিল যে, আমার মতো তোমারও নতুন ধরনের অভিজ্ঞতার প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। তা ছাড়া আমার লোকসমাজে যাতায়াত আগেও কম ছিল, এখন প্রায় নেই বললেই চলে; এবং চেনা-পরিচিতের মধ্যে মুষ্টিমেয় যে ক'জন আছে, তোমার বিশেষ গুণগুলি তাদের কারও মধ্যেই নেই।'

অতীতে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধে যে বিশেষ উত্তেজনাটা শিরায় শিরায় অনুভব করতাম, আজ এই মুহূর্তে আবার যেন তার কিছুটা অনুভব করলাম।

বললাম, 'কোথায় কখন কীভাবে যাব যদি বলে দেন...'

'সে বলে দিচ্ছি। যশোর রোড দিয়ে সোজা গিয়ে বারাসাত স্টেশনে পৌঁছে ওখানকার যে-কোনও লোককে মধুমুরলীর দিঘির কথা জিজ্ঞেস করবে। সেটা স্টেশন থেকে মাইল চারেক। সেই দিঘির পাশে একটা পুরনো ভাঙা নীলকুঠি আছে। তার পাশেই আমার বাড়ি। তোমার গাড়ি আছে তো?'

'না। তবে আমার এক বন্ধুর আছে।'

'কে বন্ধু?'

'অভিজিৎ। কলেজে সহপাঠী ছিল।'

'কেমন লোক সে? আমি চিনি?'

'চেনেন না বোধহয়। তবে লোক ভাল। মানে, আপনি যদি বিশ্বস্ততার কথা বলেন, তবে হি ইজ অল রাইট।'

'বেশ তো। তাকে নিয়েই যেও। তবে যেও নিশ্চয়ই। ব্যাপারটা জরুরি সেটা বলা বাহুল্য। বিকেলের মধ্যেই পৌঁছে যেতে চেষ্টা কোরো।'

আমার বাড়িতে টেলিফোন নেই। রাস্তার মোড়ে 'রিপাবলিক কেমিস্ট' থেকে অভিজিতের বাড়িতে ফোন করলাম। বললাম, 'চলে আয় এক্ষুনি। জরুরি কথা আছে।'

'তোর নতুন গল্প পড়ে শোনাবি তো? আবার ঘুমিয়ে পড়ব কিন্তু!'

'আরে না না। অন্য ব্যাপার।'

'কী ব্যাপার? অত আস্তে কথা বলছিস কেন?'

'একটা ভাল ম্যাস্টিফের বাচ্চার সন্ধান আছে। লোক বসে আছে আমার বাড়িতে।'

কুকুরের টোপ না ফেললে আজকাল অভিজিৎকে তার বাড়ি থেকে বার করা খুব শক্ত। পাঁচটি মহাদেশের এগারো জাতের কুকুর আছে অভিজিতের কেনেলে। তার মধ্যে তিনটি প্রাইজ-প্রাপ্ত। পাঁচ বছর আগেও এরকম ছিল না। ইদানীং কুকুরই তার ধ্যান জ্ঞান চিন্তা।

কুকুরপ্রীতির বাইরে অভিজিতের গুণ হল—আমার বুদ্ধি-বিবেচনার প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস। আমার প্রথম উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি প্রকাশকদের মনঃপূত না হওয়ায় শেষটায় অভিজিতের অর্থানুকূল্যে ছাপা হল। সে বলেছিল, 'আমি কিস্যু বুঝি না। তবে তুই যখন লিখেছিস, তখন একেবারে রাবিশ হতেই পারে না। পাবলিশারগুলো গবেট।' যাই হোক, সে বই পরে ভালই কেটেছিল, এবং নামটাও কিনেছিল। ফলে আমার প্রতি অভিজিতের আস্থার ভিত আরও দৃঢ় হয়েছিল।

ম্যাস্টিফের বাচ্চার ব্যাপারটা নিছক মিথ্যে হওয়ার দরুন একটা বড়রকম অভিমার্কা রদ্দা আমার পাওনা হল, এবং পেলামও। কিন্তু আসল প্রস্তাবটা সাদরে গৃহীত হওয়ায় রদ্দার চনচনি ভুলে গেলাম।

অভি সোৎসাহে বললে, 'অনেকদিন আউটিং-এ যাইনি। শেষ সেই সোনারপুরের ঝিলে স্নাইপ-শুটিং। কিন্তু লোকটি কে? ব্যাপারটা কী? একটু খুলে বল না বাছাধন!'

'খুলে সে নিজেই যখন বললে না, তখন আমি কী করে বলি? একটু রহস্য না-হয় রইলই। জমবে ভাল। কল্পনাশক্তিকে এক্সারসাইজ করানোর এই তো সুযোগ!'

'আহা, লোকটি কে তাই বল না!'

'কান্তিচরণ চ্যাটার্জি। বুঝলে কিছু? এককালে কিছুদিন বটানির প্রোফেসর ছিলেন স্কটিশচার্চ কলেজে। প্রোফেসারি ছেড়ে দুষ্প্রাপ্য গাছপালার সন্ধানে ঘুরতেন, সে বিষয়ে রিসার্চ করতেন, প্রবন্ধ লিখতেন। ভাল কালেকশন ছিল গাছপালার—বিশেষত অর্কিডের।'

'তোর সঙ্গে আলাপ কীভাবে?'

'আসামে কাজিরাঙা ফরেস্ট বাংলোতে। আমি বাঘ মারার তাক করছি, আর উনি খুঁজছেন নেপেন্‌থিস্।'

'কী খুঁজছেন?'

'নেপেন্‌থিস্। বটানিক্যাল নাম। সোজা কথায় "পিচার প্লান্ট" বা কলসিগাছ। আসামের জঙ্গলে পাওয়া যায়। পোকা ধরে ধরে খায়। আমি নিজে অবিশ্যি দেখিনি। কান্তিবাবুর মুখেই যা শোনা।'

'কীটখোর? পোকা খায়? গাছ পোকা খায়?'

'তোর বটানি ছিল না বোধহয়?'

'না।'

'বইয়ে ছবি দেখেছি। অবিশ্বাস করার কিছু নেই।'

'তারপর?'

'তারপর আর কী? ভদ্রলোক সে গাছ পেয়েছিলেন কিনা জানি না, কারণ শিকার শেষ করে আমি

চলে আসি, উনি থেকে যান। আমার তো ভয় ছিল, কোনও জন্তু-জানোয়ার কি সাপখোপের হাতে ওঁর প্রাণ যাবে বলে। গাছের নেশায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়তেন। কলকাতায় ফিরে এসে দু-একবারের বেশি দেখা হয়নি, তবে ওঁর কথা মনে হত প্রায়ই, কারণ সাময়িকভাবে অর্কিডের নেশা আমাকেও ধরেছিল। বলেছিলেন, আমেরিকা থেকে কিছু ভাল অর্কিড আমায় এনে দেবেন।'

'আমেরিকা? ভদ্রলোক আমেরিকা গেছেন নাকি?'

'বিলিতি কোনও-এক বটানির জার্নালে উদ্ভিদ সম্বন্ধে একটা লেখা বেরোনোর পর ওঁর বেশ খ্যাতি হয় ওদেশে। কোন-এক উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের কনফারেন্সে ওঁকে নেমন্তন্ন করেছিল আমেরিকায়। সেও প্রায় ফিফটি-ওয়ান টু-তে। তারপর এই দেখা।'

'এতদিন কী করেছেন ওখানে?'

'জানি না। তবে কাল জানা যাবে বলে আশা করছি।'

'লোকটার মাথায় ছিট-টিট নেই তো?'

'তোর চেয়ে বেশি নেই এটুকু বলতে পারি। তোর কুকুর পোষা আর ওঁর গাছ পোষা...'

অভিজিতের স্ট্যান্ডার্ড গাড়িতে করে আমরা যশোর রোড দিয়ে বারাসাত অভিমুখে চলেছি।

আমরা বলতে আমি আর অভিজিৎ ছাড়া আরও একটি প্রাণী সঙ্গে রয়েছে, সে হল অভিজিতের কুকুর 'বাদশা'। আমারই ভুল; অভিজিৎকে না বলে দিলে সে যে সঙ্গে করে তার এগারোটি কুকুরের একটিকে নিয়ে আসবেই, এটা আমার বোঝা উচিত ছিল।

বাদশা জাতে রামপুর হাউন্ড। বাদামি রঙ, বেজায় তেজিয়ান। গাড়ির পুরো পিছনদিকটা একাই দখল করে জাঁকিয়ে বসে জানলা দিয়ে মুখটা বার করে দিগন্তবিস্তৃত ধানখেতের দৃশ্য উপভোগ করছে এবং মাঝে মাঝে এক-একটা গ্রাম্য নেড়ি কুকুরের সাক্ষাৎ পেয়ে মুখ দিয়ে একটা অবজ্ঞাসূচক মৃদু শব্দ করছে।

বাদশাকে অভিজিতের সঙ্গে দেখে একটা আপত্তিকর ইঙ্গিত দেওয়ায় অভি বলল, 'তোর বরকন্দাজির উপর আর ভরসা নেই, তাই ওকে আনলাম। এতদিন বন্দুক ধরিসনি। বিপদ যদি আসেই তবে শেষ পর্যন্ত হয়তো বাদশাই কাজ করবে বেশি। ওর ঘ্রাণশক্তি অসাধারণ, আর সাহসের তো কথাই নেই!'

কান্তিবাবুর বাড়ি খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধে হল না। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় আড়াইটে। গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে খানিকটা রাস্তা গিয়ে একতলা বাংলো-ধাঁচের বাড়ি। বাড়ির পিছনদিকে কিছুটা জায়গা ছেড়ে একটা প্রকাণ্ড পুরনো শিরীষ গাছ এবং তার পাশেই বেশ বড় একটা কারখানা গোছের টিনের ছাতওয়ালা ঘর। বাড়ির মুখোমুখি রাস্তার উলটোদিকে বাগান এবং বাগানের পরে একটা লম্বা টিনের ছাউনি দেওয়া জায়গায় চকচক করছে একসারি কাচের বাক্স।

কান্তিবাবু আমাদের অভ্যর্থনা করে বাদশাকে দেখে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। বললেন, 'এ কি শিক্ষিত কুকুর?'

অভি বলল, 'আমার খুব বাধ্য। তবে কাছাকাছি অন্য শিক্ষিত কুকুর থাকলে কী করবে বলা যায় না। আপনার এখানে কোনও কুকুর-টুকুর...?'

'না। কুকুর নেই। তবে ওটাকে আপাতত বসবার ঘরের ওই জানলাটার গরাদটায় বেঁধে রাখুন।'

অভিজিৎ আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে চোখ টিপে বাধ্য ছেলের মতো কুকুরটাকে জানলার সঙ্গে বেঁধে দিল। বাদশা দু-একটা মৃদু আপত্তি জানিয়ে আর কিছু বলল না।

আমরা সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসার পর কান্তিবাবু বললেন, 'আমার চাকর প্রয়াগের ডান হাত জখম, তাই আমি নিজেই সকাল সকাল তোমাদের জন্য ফ্লাস্কে চা করে রেখেছি। যখন দরকার হয় বোলো।'

এই শান্ত নিরিবিলি জায়গায় কী বিপদ লুকিয়ে থাকতে পারে সেটা আমার মাথায় আসছিল না। দু-একটা পাখির ডাক ছাড়া আর তো কোনও শব্দই নেই। বন্দুকটা হাতে নিয়ে কেমন বোকা-বোকা লাগছিল নিজেকে, তাই সেটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে দিলাম।

অভি ছটফটে মানুষ—নেহাতই শহুরে। গ্রামাঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা, অশথপাতার হাওয়ার ঝিরঝির শব্দ, নাম-না-জানা পাখির ডাক—এসব তার মোটেই ধাতে সয় না। সে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক চেয়ে উসখুস করে বলে উঠল, 'পরিমলের কাছে শুনছিলাম আপনি নাকি আসামের জঙ্গলে এক বিদঘুটে গাছ সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রায় বাঘের খপ্পরে পড়েছিলেন?'

অভির অভ্যাসই হল রঙ চড়িয়ে নাটকীয়ভাবে কথা বলা। ভয় হল কান্তিবাবু বুঝি ফস করে রেগে ওঠেন। কিন্তু ভদ্রলোক কেবল হেসে বললেন, 'বিপদ বলতেই আপনাদের বাঘের কথা মনে হয়, না? সেটা অবিশ্যি আশ্চর্য নয়। অধিকাংশের তাই। তবে—না। বাঘের কবলে পড়িনি। জোঁকের হাতে কিছুটা নাকাল হতে হয়েছিল বটে, তাও তেমন কিছু নয়।'

'সে গাছ পেয়েছিলেন?'

এ প্রশ্নটা আমারও মাথায় ঘুরছিল।

কান্তিবাবু বললেন, 'কোন গাছ?'

'সেই যে হাঁড়ি কলসি না কী গাছ জানি...'

'ও। নেপেন্‌থিস্। হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। এখনও আছে। দেখাচ্ছি আপনাদের। এখন আর অন্য কোনও গাছে তেমন ইন্টারেস্ট নেই। কেবল কার্নিভোরাস্ প্লান্টস। অর্কিডগুলোও অধিকাংশই বিদেয় করে দিয়েছি।'

কান্তিবাবু উঠে ঘরের ভিতরে চলে গেলেন। আমি আর অভি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। কার্নিভোরাস্ প্লান্টস—অর্থাৎ মাংসাশী গাছ। পনেরো বছর আগে পড়া বটানির বইয়ের একটি পাতা ও কয়েকটি ছবি আবছাভাবে মনে পড়ে গেল।

কান্তিবাবু বেরোলেন হাতে একটি বোতল নিয়ে।

বোতলটা আমাদের সামনে ধরতে দেখলাম, তাতে উচ্চিংড়ে জাতীয় নানান সাইজের সব পোকা ঘোরাফেরা করছে। বোতলের ঢাকনায় গোলমরিচদানের ঢাকনার মতো ছোট ছোট ফুটো।

কান্তিবাবু হেসে বললেন, 'ফিডিং টাইম। এসো আমার সঙ্গে।'

আমরা কান্তিবাবুর পিছন পিছন টিনের ছাউনি দেওয়া লম্বা ঘরটার দিকে গেলাম।

গিয়ে দেখি সারবাঁধা কাচের বাক্সগুলোর মধ্যে এক-একটায় এক-একরকম গাছ; তার কোনওটাই এর আগে চোখে দেখিনি।

কান্তিবাবু বললেন, 'এর কোনওটাই বাংলাদেশে পাবে না—অবিশ্যি ওই নেপেন্‌থিস্ ছাড়া। একটা আছে নেপাল থেকে আনানো। একটা আফ্রিকার। অন্য সবক'টাই প্রায় মধ্য আমেরিকার।'

অভিজিৎ বলল, 'এসব গাছ এখানে বেঁচে রয়েছে কী করে? এখানকার মাটিতে কি—?'

'মাটির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই এদের।'

'তবে?'

'এরা মাটি থেকে প্রাণ সঞ্চয় করে না। মানুষ যেমন ঠিকমতো খাদ্য পেলে নিজের দেশের বাইরে অনেক জায়গাতেই স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকতে পারে—এরাও তেমনই ঠিকমতো খেতে পেলেই বেঁচে থাকে, সে যেখানেই হোক।'

কান্তিবাবু একটা কাচের বাক্সের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভিতরে এক আশ্চর্য গাছ। ইঞ্চি দুই লম্বা সবুজ পাতাগুলোর দু'পাশে সাদা সাদা দাঁতের মতো খাঁজ-কাটা।

বাক্সটার সামনের দিকে কাচের গায়ে একটা ছিটকিনি-দেওয়া বোতলের মুখের সাইজের গোল দরজা। কান্তিবাবু দরজাটা খুললেন। তারপর বোতলের ঢাকনিটা খুলে ক্ষিপ্র হস্তে বোতলের মুখটা দরজার ভিতরে গলিয়ে দিলেন।

উচ্চিংড়েটা এদিক-ওদিক লাফিয়ে গাছটার পাতার উপর বসল, এবং বসতেই তৎক্ষণাৎ পাতাটা মাঝখান থেকে ভাঁজ হয়ে গিয়ে পোকাটাকে জাপটে ধরল। অবাক হয়ে দেখলাম যে, দু'দিকের দাঁত পরস্পরের খাঁজে খাঁজে বসে যাওয়ায় এমন একটি খাঁচার সৃষ্টি হয়েছে, যার থেকে উচ্চিংড়ে বাবাজির আর বেরোবার কোনও রাস্তাই নেই।

প্রকৃতির এমন তাজ্জব, এমন বীভৎস ফাঁদ আমি আর কখনও দেখিনি।

অভি ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'পোকাটা যে ওই পাতাটাতেই বসবে তার কোনও গ্যারান্টি আছে কি?'

কান্তিবাবু বললেন, 'আছে বইকী! গাছগুলো থেকে এমন একটা গন্ধ বেরোয় যেটা পোকা অ্যাট্রাক্ট করে। এটা হল Venu's Fly Trap। মধ্য আমেরিকা থেকে আনা। বটানির বইয়েতে এর কথা পাবে।'

আমি অবাক বিস্ময়ে উচ্চিংড়ের দশা দেখছিলাম। প্রথমে কিছুক্ষণ ছটফট করেছিল। এখন দেখলাম একেবারে নির্জীব। আর দেখলাম যে পাতার চাপ ক্রমশ বাড়ছে। টিকটিকির চেয়ে এ গাছ কম হিংস্র কীসে?

অভি কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, 'এঃ—এমন গাছ একটা বাড়িতে থাকলে তো পোকামাকড়ের উৎপাত থেকে অনেকটা রেহাই পাওয়া যেত। আরশোলার জন্য আর ডি-ডি-টি পাউডার ছড়াতে হত না।'

কান্তিবাবু বললেন, 'এ গাছ আরশোলা হজম করতে পারবে না। তা ছাড়া এর পাতার আয়তনও ছোট। আরশোলার জন্য অন্য গাছ। এই যে—এদিকে।'

পাশের বাক্সের সামনে গিয়ে দেখি লিলির মতো বড় বড় লম্বা পাতাওয়ালা একটা গাছ। প্রত্যেকটা পাতার ডগা থেকে একটি করে ঢাকনা সমেত থলির মতো জিনিস ঝুলছে। এটার ছবি মনে ছিল, তাই আর চিনিয়ে দিতে হল না।

কান্তিবাবু বললেন, 'এই হল নেপেন্‌থিস্ বা পিচার প্ল্যান্ট। এর খাঁই অনেক বেশি। প্রথম যখন গাছটি পাই তখন ওই থলির মধ্যে একটা ছোট্ট পাখিকে ছিবড়ে অবস্থায় পেয়েছিলাম।

'বাপরে বাপ!' অভির তাচ্ছিল্যের ভাব ক্রমশই অন্তর্হিত হচ্ছিল। 'এখন ওটা কী খায়?'

'আরশোলা, প্রজাপতি, শুঁয়োপোকা—এইসব আর কি! মাঝে আমার কলে একটা ইঁদুর ধরা পড়েছিল। সেটাও খাইয়ে দেখেছিলাম, আপত্তি করেনি। তবে গুরুপাকের ফলে এসব গাছ অনেক সময়ে মরে যায়। অত্যন্ত লোভী তো! কোন অবধি ভোজন সইবে সেটা নিজেরাই আন্দাজ করতে পারে না।'

ক্রমবর্ধমান বিস্ময়ে এ-বাক্স থেকে ও-বাক্স ঘুরে গাছগুলো দেখতে লাগলাম। বাটারওয়ার্ট, সানডিউ, ব্ল্যাডারওয়ার্ট, অ্যারজিয়া—এগুলোর ছবি আগে দেখেছি। তাই মোটামুটি চিনতেও পারলাম। কিন্তু অন্যগুলো একেবারে নতুন, একেবারে তাজ্জব, একেবারে অবিশ্বাস্য। প্রায় বিশ রকমের মাংসাশী গাছ কান্তিবাবু সংগ্রহ করেছেন, তার কোনও-কোনওটা পৃথিবীর অন্য কোনও কালেকশনেই নাকি নেই।

এর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর গাছ যেটি—সানডিউ—তার ছোট্ট পাতাগুলোর চারপাশে সরু লম্বা লম্বা রোঁয়ার ডগায় জলবিন্দু চকচক করছে।

কান্তিবাবু একটি সুতোর ডগায় এলাচের দানার সাইজের একটুকরো মাংস ঝুলিয়ে সুতোটাকে আস্তে আস্তে পাতাটির কাছে নিয়ে যেতে খালি চোখেই দেখতে পেলাম, রোঁয়াগুলো সব একসঙ্গে লুব্ধ ভঙ্গিতে মাংসখণ্ডটার দিকে উঁচিয়ে উঠল।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে কান্তিবাবু বললেন, 'মাংসটা পেলে পাতাটা Fly Trap-এর মতোই ওটাকে জাপটে ধরে নিত। তারপর পুষ্টিকর যা-কিছু শুষে নিয়ে অকেজো ছিবড়েটাকে ফেলে দিত। তোমার-আমার খাওয়ার সঙ্গে কোনও তফাত নেই, কী বলো?'

আমরা শেড থেকে বেরিয়ে বাগানে এলাম।

শিরীষ গাছের ছায়াটা লম্বা হয়ে বাগানের উপর পড়েছে। ঘড়িতে দেখলাম চারটে বাজে।

কান্তিবাবু বললেন, 'এর অধিকাংশ গাছের কথাই তোমার বটানির বইয়ে পাবে। তবে আমার যেটি সবচেয়ে আশ্চর্য সংগ্রহ, সেটির কথা আমি না লিখলে কোনও বইয়ে থাকবে না। সেটির জন্যই আজ তোমাদের এখানে আসতে বলা। চলো পরিমল। চলুন অভিজিৎবাবু।'

কান্তিবাবুর পিছন পিছন এবার আমরা বড় কারখানা-ঘরটার দিকে এগোলাম।

টিনের দরজাটা তালা দিয়ে বন্ধ। দু'দিকে দুটো জানলা রয়েছে। তারই একটা হাত দিয়ে ঠেলে খুলে নিজে উঁকি মেরে আমাদের বললেন, 'দেখো।'

অভি আর আমি জানলায় মুখ লাগালাম।

ঘরের পশ্চিম দিকের দেয়ালের উপর দিকের দুটো কাচের জানলা যা স্কাইলাইট দিয়ে রোদ আসায় ভিতরটা কিছু আলো হয়েছে।

ঘরের মধ্যে যে জিনিসটা রয়েছে, হঠাৎ দেখলে সেটাকে গাছ বলে মনে হওয়ার কথা নয়। বরং একাধিক শুঁড়বিশিষ্ট কোনও আজব জানোয়ার বলে মনে হতে পারে। ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, গুঁড়ি একটা আছে। সেটা পাঁচ-ছ' হাত উঠে একটা মাথায় শেষ হয়েছে, এবং সেই মাথার হাতখানেক নীচে মাথাটাকে গোল করে ঘিরে কতগুলো শুঁড়ের উৎপত্তি হয়েছে। গুনে দেখি সাতটা শুঁড়।

গাছের গা পাংশুটে মসৃণ, এবং সর্বাঙ্গে ব্রাউন চাকা চাকা দাগ।

শুঁড়গুলো আপাতত মাটিতে নুয়ে পড়ে আছে। কেমন যেন নির্জীব ভাব। কিন্তু তাও গা-টা ছমছম করে উঠল।

অন্ধকারে চোখটা অভ্যস্ত হলে আরও একটা জিনিস লক্ষ করলাম। ঘরের মেঝেতে গাছের চারিদিকে পাখির পালক ছড়িয়ে আছে।

কতক্ষণ চুপ করে ছিলাম জানি না। কান্তিবাবুর গলার স্বরে আবার যেন সংবিৎ ফিরে পেলাম।

'গাছটা এখন ঘুমোচ্ছে। ওঠবার সময় হল বলে।'

অভি অবিশ্বাসের সুরে বলল, 'ওটা কি সত্যিই গাছ?'

কান্তিবাবু বললেন, 'মাটি থেকে গজাচ্ছে যখন, তখন গাছ ছাড়া আর কী বলবেন বলুন! হাবভাব অবিশ্যি গাছের মতো নয়। অভিধানে এর উপযুক্ত কোনও নাম নেই।'

'আপনি কী বলেন?'

'সেপ্টোপাস। অথবা বাংলায় সপ্তপাশ। পাশ—অর্থাৎ বন্ধন; যেমন নাগপাশ।'

আমরা বাড়ির দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। বললাম, 'এ গাছ পেলেন কোথায়?'

'মধ্য আমেরিকার নিকারাগুয়া হ্রদের কাছেই গভীর জঙ্গল আছে; তার ভিতরে।'

'অনেক খুঁজতে হয়েছে বলুন?'

'ওই অঞ্চলেই যে আছে সেটা জানা ছিল। তোমরা বোধহয় প্রোফেসর ডানস্টান-এর কথা শোনোনি? উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও পর্যটক ছিলেন। মধ্য আমেরিকায় গাছপালার সন্ধান করতে গিয়ে প্রাণ হারান। ঠিক কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয় কেউ জানতে পারেনি; মৃতদেহ সম্পূর্ণ নিখোঁজ হয়ে যায়। তাঁর তৎকালীন ডায়রির শেষের দিকে এ গাছটার উল্লেখ পাওয়া যায়।

'আমি তাই প্রথম সুযোগেই নিকারাগুয়ার দিকে চলে যাই। গুয়াটেমালা থেকেই স্থানীয় লোকের কাছে এ গাছের বর্ণনা শুনতে থাকি। তারা বলে শয়তান গাছ। শেষটায় অবিশ্যি এমন গাছ একাধিক চোখে পড়ে। বাঁদর, আরমাডিলো, অনেক কিছু খেতে দেখেছি এ গাছকে। অনেক খোঁজার পর একটা অল্পবয়স্ক ছোটখাটো চারাগাছ পেয়ে সেটাকে তুলে আনি। দু' বছরে গাছের কী সাইজ হয়েছে দেখতেই পাচ্ছ।'

'এখন কী খায় গাছটা?'

'যা দিই তাই খায়। কলে ইঁদুর ধরে খেতে দিয়েছি। তারপর প্রয়াগকে বলে দিয়েছিলাম—বেড়াল কুকুর চাপা পড়লে ধরে আনতে, তাও দিয়েছি। তারপর তুমি আমি যা খাই তাও দিয়েছি—অর্থাৎ মুরগি, ছাগল। ইদানীং খিদেটা খুব বেড়েছে। খাবার জুগিয়ে উঠতে পারছি না। বিকেলের দিকে ঘুম ভাঙার পর ভয়ানক ছটফট করে। কাল তো একটা কাণ্ডই হয়ে গেল। প্রয়াগ গিয়েছিল একটা মুরগি দিতে। হাতিকে যেভাবে খাওয়ায় সেভাবেই খাওয়াতে হয়। প্রথমে গাছটার মাথায় একটা ঢাকনা খুলে যায়। তারপর শুঁড় দিয়ে খাবারটা হাত থেকে নিয়ে মাথার গর্তের মধ্যে পুরে দেয়। একটা যে-কোনও খাবার পেটে পুরলে কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চিন্ত থাকা যায়। তারপর আবার শুঁড়গুলো দোলাতে আরম্ভ করলে বোঝা যায় যে, আরও খেতে চাইছে।

'এতদিন দুটো মুরগি অথবা একটি কচি পাঁঠায় একদিনের খাওয়া হয়ে যেত। কাল থেকে তার ব্যতিক্রম হচ্ছে। কাল দ্বিতীয় মুরগিটা দিয়ে প্রয়াগ দরজা বন্ধ করে চলে এসেছিল। অস্থির অবস্থায় শুঁড়গুলো আছড়ালে একটা শব্দ হয়। দ্বিতীয় মুরগির পরেও হঠাৎ সেই আওয়াজটা পেয়ে প্রয়াগ

গিয়েছিল অনুসন্ধান করতে।

'আমি তখন ঘরে বসে ডায়রি লিখছি। হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি সেন্টোপাস্-এর একটি শুঁড় প্রয়াগের ডান হাতটা আঁকড়ে ধরেছে। প্রয়াগ প্রাণপণে সেটা টেনে ছাড়াবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেইসঙ্গে সেন্টোপাস্-এর আর একটি শুঁড় লকলক করে প্রয়াগের দিকে এগোচ্ছে।

'আমি দৌড়ে গিয়ে আমার লাঠি দিয়ে শুঁড়টায় এক প্রচণ্ড আঘাত করে দু' হাত দিয়ে প্রয়াগকে টেনে কোনওমতে তাকে উদ্ধার করি। তবে চিন্তার কারণ হচ্ছে এই যে, প্রয়াগের হাতের খানিকটা মাংস সেন্টোপাস্ খাবলে নিয়েছিল, এবং সেটাই সে পেটের মধ্যে পুরেছে, এ আমার নিজের চোখে দেখা।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে বারান্দায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। কান্তিবাবু একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'সেন্টোপাস্-এর যে মানুষের প্রতি লোভ বা আক্রোশ থাকতে পারে তার কোনও ইঙ্গিত এতদিন পাইনি। কাল যখন পেলাম, তারপরে, এটাকে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোনও উপায় দেখছি না। কাল একবার খাবারে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিলাম—কিন্তু কী আশ্চর্য বুদ্ধি গাছটার—সে-খাবার ও শুঁড়ে নিয়েই ফেলে দিল। একমাত্র উপায় হল গুলি করে মারা। পরিমল, তোমায় কেন ডেকেছি সেটা বুঝতে পারছ তো!'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'গুলি করলে ও মরবে কিনা সেটা আপনি জানেন?'

কান্তিবাবু বললেন, 'মরবে কিনা জানি না। তবে আমার বিশ্বাস, ব্রেন বলে ওর একটা জিনিস আছে। ওর চিন্তাশক্তি যে আছে তার তো প্রমাণই পেয়েছি, কারণ আমি তো কতবার ওর কত কাছে গেছি—ও তো আমাকে কোনওদিন আক্রমণ করেনি। আমাকে চেনে—যেমন কুকুর তার মনিবকে চেনে। প্রয়াগের উপর আক্রোশের কারণ হচ্ছে যে, প্রয়াগ কয়েকবার ওর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করার চেষ্টা করেছে। খাবারের লোভ দেখিয়ে, দেয়নি; কিংবা শুঁড়ের ডগার কাছে নিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে নিয়েছে। মস্তিষ্ক ওর আছেই, এবং আমার বিশ্বাস, সেটা যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে—অর্থাৎ ওর মাথায়। যেখানে ঘিরে শুঁড়গুলো বেরিয়েছে সেখানেই তোমায় তাগ করে গুলি ওর মাথাতেই মারতে হবে।'

অভি ফস করে বলল, 'সে আর এমন কী! সে তো এক মিনিটের মধ্যেই পরীক্ষা করে দেখা যায়। পরিমল, তোর বন্দুকটা—'

কান্তিবাবু হাত তুলে অভিকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'শিকার যদি ঘুমিয়ে থাকে, তখন কি তাকে মারা চলে? পরিমলের হান্টিং কোড কী বলে?'

আমি বললাম, 'ঘুমন্ত শিকারকে গুলি করা একেবারেই নীতিবিরুদ্ধ। বিশেষত শিকার যেখানে চলেফিরে বেড়াতে পারে না, সেখানে তো এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না।'

কান্তিবাবু ফ্লাস্কে এনে চা পরিবেশন করলেন। চা-পান শেষ হতে না হতে মিনিট পনেরোর মধ্যেই সেন্টোপাসের ঘুম ভাঙল।

বাদশা পাশের ঘরে কিছুক্ষণ থেকেই উসখুস করছিল। হঠাৎ একটা খচমচ আর গোঙানির শব্দ পেয়ে অভি আর আমি উঠে গিয়ে দেখি বাদশা দাঁত দিয়ে প্রাণপণে তার বকলসটাকে ছেঁড়বার চেষ্টা করছে। অভি ধমক দিয়ে বাদশাকে নিরস্ত করতে গেছে, এমন সময় কারখানা-ঘর থেকে একটা সপাত শব্দ আর তার সঙ্গে একটা উগ্র গন্ধ পেলাম। গন্ধটা এমন, যার তুলনা দেওয়া মুশকিল। ছেলেবেলায় টনসিল অপারেশনের সময় ক্লোরোফর্ম শুঁকতে হয়েছিল, তার সঙ্গে হয়তো কিছুটা মিল আছে।

কান্তিবাবু হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বললেন, 'চলো, সময় হয়েছে।'

আমি বললাম, 'গন্ধটা কীসের?'

'সেন্টোপাস্-এর। এই গন্ধ ছড়িয়েই ওরা শিকার—'

কান্তিবাবুর কথা শেষ হল না। বাদশা প্রচণ্ড এক টানে বকলস ছিঁড়ে ধাক্কার চোটে অভিকে উলটিয়ে ফেলে তীরবেগে পাগলের মতো ছুটল ওই গন্ধের উৎসের দিকে।

অভিও কোনওমতে উঠে 'সর্বনাশ' বলে ছুটল বাদশার পিছনে।

আমি গুলিভরা বন্দুক নিয়ে কারখানা-ঘরের দিকে ছুটে গিয়ে দেখি, বাদশা এক বিরাট লাফে একমাত্র খোলা জানলার উপর উঠল এবং অভির বাধা দেবার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে ঘরের ভিতর

ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কান্তিবাবু চাবি দিয়ে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলাম রামপুর হাউন্ডের মর্মান্তিক আর্তনাদ।

ঢুকে দেখি—এক শুঁড়ে শানাচ্ছে না; একের পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শুঁড় দিয়ে সেপ্টোপাস্ বাদশাকে মরণপাশে আবদ্ধ করেছে।

কান্তিবাবু চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'তোমরা আর এগিও না! পরিমল, চালাও গুলি!'

বন্দুক উঁচিয়েছি এমন সময় চিৎকার এল, 'থামো।'

অভিজিতের কাছে তার কুকুরের মূল্য কতখানি তা এবার বুঝতে পারলাম। সে কান্তিবাবুর বারণ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ছুটে গিয়ে সেপ্টোপাস্-এর তিনটে শুঁড়ের একটাকে আঁকড়ে ধরল।

তখন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

তিনটে শুঁড়ই একসঙ্গে বাদশাকে ছেড়ে দিয়ে অভিকে আক্রমণ করল। আর অন্য চারটে শুঁড় যেন মানুষের রক্তের লোভেই হঠাৎ সজাগ হয়ে লোলুপ জিহ্বার মতো লকলক করে উঠল।

কান্তিবাবু আবার বললেন, 'চালাও—চালাও গুলি! ওই যে মাথা।'

সেপ্টোপাস্-এর মাথায় দেখলাম একটা ঢাকনি আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। ঢাকনির নীচে গহ্বর। আর অভিসমেত শুঁড়গুলি শূন্যে উঠে সেই গহ্বরের দিকে চলেছে।

অভির মুখ রক্তহীন ফ্যাকাশে, তার চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

চরম সংকটের মুহূর্তে—আমি এর আগেও দেখেছি—আমার স্নায়ুগুলো সব যেন হঠাৎ কেমন ম্যাজিকের মতো সংযত, সংহত হয়ে যায়।

আমি নিষ্কম্প হাতে বন্দুক নিয়ে সেপ্টোপাস্-এর মাথার দুটি চক্রের মধ্যিখানে অব্যর্থ নিশানায় গুলি ছুড়লাম।

ছোড়ার পরমুহূর্তেই, মনে আছে, ফিনকি দিয়ে গাছের মাথা থেকে লাল রক্তের ফোয়ারা। আর মনে আছে, শুঁড়গুলো অভিকে মুক্তি দিয়ে মাটিতে নেতিয়ে পড়ছে, আর সেইসঙ্গে আগের সেই গন্ধটা হঠাৎ তীব্রভাবে বেড়ে উঠে আমার চেতনাকে আচ্ছন্ন, অবশ করছে।...

আগের ঘটনার পর চার মাস কেটে গেছে। এতদিনে আবার আমার অসমাপ্ত উপন্যাসটা নিয়ে পড়েছি।

বাদশাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তবে অভি ইতিমধ্যে একটি ম্যাস্টিফ ও একটি তিব্বতী কুকুরের বাচ্চা সংগ্রহ করেছে এবং আরেকটি রামপুর হাউন্ডের সন্ধান করছে। অভির পাঁজরের দু'খানা হাড় ভেঙেছিল। দু' মাস প্লাস্টারে থাকার পর জোড়া লেগেছে।

কান্তিবাবু কাল এসেছিলেন। বললেন কীটখোর গাছপালা সব বিদেয় করে দেবার কথা ভাবছেন।

'বরং সাধারণ শাক-সবজি নিয়ে একটু গবেষণা করলে ভাল হয়। ঝিঙে, উচ্ছে, পটল—এইসব আর কি! যদি বলো, তোমায় কিছু গাছ দিতে পারি। তুমি আমার এত উপকার করলে! এই ধরো একটা নেপেন্থিস্; তোমার ঘরের পোকাগুলোকে অন্তত—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'না না। ওসব আপনি ফেলে দিতে চান তো ফেলে দিন। পোকা ধরার জন্য আমার গাছের দরকার নেই।'

কিং কোম্পানির ক্যালেন্ডারের পিছন দিক থেকে শব্দ এল, 'ঠিক ঠিক ঠিক।'

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৬৯